

শিশু-নারী পাচারের অভিযোগ চট্টগ্রামের কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে



বিনাইদহে উদ্ধারকৃত ১৮ জন নারী ও শিশু। পেছনে ২ পাচারকারী। এরা প্রত্যেকেই গিয়েছে মায়ানমার-টেকনাফ-কক্সবাজার-চট্টগ্রাম সীমান্ত পথ দিয়ে

সাপ্তাহিক ২০০০ রিপোর্ট

চিহ্নিত সংঘবদ্ধ চক্রের হাতে গত ৫ বছরে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকা থেকে পাচার হয়েছে ৩ হাজারেরও বেশি শিশু। এরা পাচার হচ্ছে মূলত ‘এতিমখানা’ থেকে। দেশের প্রায় ৭০০০ কওমী মাদ্রাসার মধ্যে বড় মাদ্রাসাগুলোর অনুদানের বিশাল অংশ আসে এতিমখানা দেখিয়ে। ‘এতিমখানা’য় অনাথ শিশুদের ধর্ম শিক্ষায় এবং আশ্রয় দেবার নামে প্রবঞ্চিত করা হচ্ছে এসব কওমী মাদ্রাসায়। একটু বড় হয়ে কেউ জঙ্গি মুজাহিদ, কেউ অনিশ্চিত জীবনযাত্রা, কেউ পাচারকারী চক্রের হাতে পাকিস্তান বা মধ্যপ্রাচ্যের শেখদের উটের জকির নির্মম ও অমানবিক কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। যাদের কথা বলে অর্থ আনা হচ্ছে তাদেরকেই পাচার করা হচ্ছে অমানবিকভাবে। অনুদানপ্রাপ্তি স্বীকার পর্বে অনাথদের আশ্রয়দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তাদের দায়িত্ববোধ। অভিযোগ রয়েছে, পাচারকারী চক্রের সঙ্গে এসব মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের গোপন আঁতাত রয়েছে।

শিশু পাচারের ধারাবাহিকতার কিছু ঘটনা

* ৫ জুন ২০০০ চট্টগ্রামের নিউমার্কেট এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হয় ১১ শিশু-কিশোর। জানা যায়, লালখান বাজার দারুল উলুম

মাদ্রাসার ‘এতিমখানা’ থেকে এই শিশুগুলো পাচার হচ্ছিলো।

* ৬ জুন ২০০০ লালখান বাজার দারুল উলুম মাদ্রাসা ‘এতিমখানা’ থেকে পুলিশ ৭ শিশুকে উদ্ধার করে। এরা প্রত্যেকে কক্সবাজার রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির থেকে পাচার হয়ে যাওয়া শিশু।

* ২৩ জানুয়ারি ২০০০ পুলিশ উদ্ধার করে ৭২ নারী-পুরুষ-শিশু। পাকিস্তানের নাগরিক শফি আলমের নেতৃত্বে পাচারকারী চক্র মাদ্রাসায় পড়ানো এবং চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে এদের নিয়ে যাচ্ছিলো (সূত্র: প্রথম আলো ২৪-৭-০৩) এদের মধ্যে ৩৭ জন ১০ থেকে ১২ বছরের শিশু-কিশোর।

এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলেও সরকারি-বেসরকারি কোনো রেকর্ড এখনো হয়নি।

২৮ জুন ’০৩ মাদ্রাসা ছাত্র জাফর আলম (১৬) পাচারকারীদের মাধ্যমে উটের জকির দুঃসহ জীবন থেকে ফিরে এসে বর্ণনা দেয় ১১ বছর আগের দুঃসহ স্মৃতির।

১২ জুন ২০০৩ কক্সবাজার হাশেমিয়া আলিয়া মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র জাফর আলম (১৩) পিতা মোজাহের মিয়াকে (কুতুবদিয়া পাড়া) লুনিয়াছড়া থেকে অপহরণ করে।

৪ দিন পর ১৬ জুন কৌশলে পালিয়ে সাংবাদিকদের জানায় আরো ৩০-৪০ জন বন্দি

শিশু-কিশোরের সঙ্গে উখিয়ার গহিন জঙ্গলের আশ্রয় ছিল সে। এর সঙ্গেও চট্টগ্রামের কওমী মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল বলে জানা যায়।

২৭ মে ২০০৪ উখিয়ার সীমান্তবর্তী পালনখালীর শিশু নেজাম আলী নিখোঁজ হয়। ১৬ জুন জাফর (১২) কুতুবদিয়া পাড়া থেকে নিখোঁজ হয়। ৩ জুন বালুয়াখালীর আব্দুর রহমান (১০), ৭ জুন রফিজ উদ্দিন (৯) ধলগাচা মহেশখালীতে নিখোঁজ হয়।

* জুন-জুলাই ’০৪ ঢাকার ফকিরাপুল এলাকার একটি হোটেল থেকে ১৮ শিশু, ২৫ মহিলা এবং ৩ পাচারকারী গ্রেপ্তার হয়। পাচারকারী দু’জন টেকনাফের। এদের স্বীকারোক্তি মতে এই শিশুদের মাদ্রাসায় উচ্চশিক্ষার প্রলোভন দেখিয়ে টেকনাফের কোনো কোনো মাদ্রাসা থেকে সৌদি আরবে পাচার করে দেয়া হচ্ছিল।

কক্সবাজার জেলার ২৫০০ কওমী মাদ্রাসার মধ্যে প্রায় ২০০টি বড় মাদ্রাসার এতিমখানা আছে। প্রতিটিতে গড়ে ১০০ ছাত্র হলেও প্রায় ২০,০০০ শিশু নিয়ে এসব এতিমখানা। কোনো পরিসংখ্যান কখনো হয়নি। সরকারি-বেসরকারি হিসাবে প্রকৃত এতিমখানার সংখ্যা কেউ জানে না। এরা অনাথদের ছবি দেখিয়ে ইসলামী রাস্তাসমূহের অনুদান এনে নিজেদের আখের গোছায়, বঞ্চিত করে অনাথদের। স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা থেকে হারিয়ে যায় এদের সব স্বপ্নসাপ!

* এখানে নূরানী শিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া আর কোনো শিক্ষা হয় না।

* হাদিস কোরআন শেখার পর কেউ কেউ কোরআনে হাফেজ হয়ে জীবন কোনোভাবে চালিয়ে নেয়।

* কেউ আবার ৫ বছর পর জঙ্গি প্রশিক্ষণে ‘নির্বাচিত’ হয়ে পুরোপুরি জঙ্গি ‘মুজাহিদ’ হয়ে যায়। হাতে তুলে নেয় সভ্যতা ধ্বংসের খড়্গ-কুপাণ।

* অনেকেই পাচারকারীর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য বা পাকিস্তানে নির্বাসিত হয়। উটের জকি অথবা কোনো অন্ধকার জগতের একজন হয়ে চালিয়ে নেয় জীবন।

* অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার সরবরাহ হয়, যা না দিলেই নয়।

* স্বাভাবিক জীবনবোধ এবং মানবিক মূল্যবোধ থেকে ধীরে ধীরে অনেক দূরে সরিয়ে কঠিন করে তোলা হয় কোমল প্রাণকে।

* উন্নত জীবনযাত্রা, ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান, ছাত্রদের উচ্চতর মাদ্রাসা শিক্ষার প্রলোভনে অনাথ শিশুদের এসব মাদ্রাসায় ভর্তি করে স্বপ্নহীন, নিঃস্ব করে বুকিপূর্ণ অনিশ্চিত জীবনে ঠেলে দেয়া হয়।

উটের জকি হিসেবে ১১ বছর

ফেব্রুয়ারি ’৯২তে উখিয়ার জলদিয়া পালং

ইউনিয়নের কুলপাড়া গ্রামের দিনমজুর মীর আহমদের শিশুপুত্র জাফর আলমকে (৫) একই উপজেলার রত্নাপালং গ্রামের কবির আহমদ চৌধুরীর পুত্র নূরুল কাদের পাচার করে দুবাই পাঠিয়ে দেয়। নূরুল কাদের জাফরকে তার পুত্র 'গোলাম কাদের' নামে পাচার করে। দুবাই প্রবাসী উখিয়ার শাহ আলম বেশ মোটা টাকার বিনিময়ে সেখানকার শেখ রাশেদ শাহ সালেমের উটের জকি হিসেবে বিক্রি করে দেয়। জাফরের দরিদ্র পিতা হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে প্রকৃত তথ্য জানতে পারেন। ২১ সেপ্টেম্বর '০২ সংঘবদ্ধ অপহরণ চক্রের বিরুদ্ধে তিনি মামলা করেন। নারী-শিশু নির্ধাতন দমন আইনে এ চক্রের প্রধান নূরুল কাদেরকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ। মার্চে পুত্র জাফরকে উদ্ধারের দাবি জানিয়ে দুবাইয়ের বাংলাদেশ দূতাবাসে চিঠি পাঠান মীর আহমদ। এর প্রেক্ষিতে জাফর আলম উদ্ধার হয় বাংলাদেশ দূতাবাসের কর্মকর্তাদের দ্বারা। ২৪ জুন উখিয়ার বাসিন্দা প্রবাসী কবির আহমদের সঙ্গে জাফরকে চট্টগ্রাম পাঠানো হয়। ২৫ জুন ২০০৩ বিকেলে জামায়াত নেতা অ্যাডভোকেট শাহ জালাল চৌধুরীর হাতে জাফরকে তুলে দেন কবির আহমেদ। উখিয়া পুলিশ জাফরকে নিয়ে পরদিন কোর্টে ১৬৪ ধারা জবানবন্দি দিয়ে তার বাবার হাতে তুলে দেয়।

উটের জকি মানেই বাংলাদেশী শিশু

জাফরের জবানবন্দি থেকে জানা যায়, দুবাইয়ের রাশেদ শাহ সালেমের ৫২টি উটের জন্য আরো ৫২ বাংলাদেশী শিশু আছে। এদের অনেকেই তার চেনা এলাকার চেনামুখ। আরো প্রায় এক হাজার বাংলাদেশী শিশু অন্যান্য মালিকের উট দেখাশোনার বা জকির দায়িত্বে রয়েছে। জাফর দশ বছরে ছয়বার উটের জকি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। কোনোবারই জয়ী হয়নি। তবে উটের পিঠ থেকে পড়ে তিন শিশুর মৃত্যু চাক্ষুষ করেছে জাফর। '৯৫তে জাফর নিজেই পড়ে মারাত্মক আহত হয়। প্রায় ১ লাখ সৌদি রিয়েল খরচ করে মালিক তাকে সুস্থ করে আবার 'জকি'র কাজে দেয়।

রুটি খেয়ে প্রতিদিন ভোর ৪টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বিশাল মরুভূমি এলাকা ঘুরে আসতে হতো জাফরকে। তার ধারণা, এ রকম ১ হাজার শিশুকে জকির কাজ করতে হয় যা সে দেখেছে।

জাফরের পিতা মীর আহমদ পুত্রকে ফিরে পেয়ে আনন্দিত হলেও মূল অপরাধীদের শাস্তি দাবি করেছেন বারবার। অথচ প্রশাসনের প্রশ্নে সরকারি দলের নেতা আবুল ফজলসহ পাচারকারী চক্রের মূল হোতাদের এখনো গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। প্রকাশ্যে বীরদর্পে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এরা।

বাংলা জানে না জাফর। আরবি ও হিন্দিভাষী জাফর উখিয়ার বিভিন্ন জলাশয়ে মাছ ধরে জীবিকা চালিয়ে নিচ্ছে। এই প্রতিবেদক

বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করেও তার দেখা পায়নি। স্থানীয়দের মতে কোনো শিক্ষাগত যোগ্যতা বা প্রচলিত ভাষায় কথা বলতে বা বুঝতে অক্ষম জাফর। তার মানসিক স্থিরতা এখনো হয়নি। পারিবারিক অবস্থান এখনো অস্থিতিশীল বলে সূত্রে প্রকাশ।

কওমী মাদ্রাসা আর একশ্রেণীর টাউট রাজনীতিবিদরা যৌথভাবে জাফরদের পাচার করছে মধ্যপ্রাচ্যে।

রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এতিমখানা

১. টেকনাফের হীলা দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বলেন, এতিমখানার ৩৫০ শিশুর মধ্যে ২০০ রোহিঙ্গা। এতিমখানা তো চালাতে হবে তাই এদের রাখতে হয়।

২. টেকনাফ জামেয়া আল-ইসলামিয়া মাদ্রাসার সাড়ে তিনশ' ছাত্রের অধিকাংশ রোহিঙ্গা।

৩. টেকনাফ শাহপরীর দ্বীপ বাহারুল উলুম মাদ্রাসার প্রায় ২০০ ছাত্রের অধিকাংশ রোহিঙ্গা।

৪. সাত্রাং ফোরকানিয়া মাদ্রাসা।

৫. নয়াপাড়া দারুল উলুম মাদ্রাসা।

৬. টেকনাফ সদর ইউনিয়ন লেঙ্গুরবিল মাদ্রাসা।

৭. মহেশখালী গোরকঘাটা ইসলামিয়া জামেয়া মাদ্রাসার ২০০ ছাত্রের ৩৫% রোহিঙ্গা।

৮. রাজাপালাং মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিজে পাচারের দায়ে অভিযুক্ত।

প্রায় দু'শতাধিক এতিমখানার মধ্যে এ ৮টি মাদ্রাসা আলোচিত এবং প্রথম দুটি মাদ্রাসা বৃহত্তম বলে স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ। উল্লেখ্য, পটিয়া আল-জামেয়া মাদ্রাসার পরেই প্রথম দুটি মাদ্রাসার নাম আসে। এছাড়া অসংখ্য মাদ্রাসা ব্যয়বহুল পরিসর আকর্ষণীয় অবয়বে নজর কাড়ে প্রত্যন্ত জনপদে।

সংঘবদ্ধ চক্রের প্রধান বা হোতা হিসেবে যারা অভিযুক্ত

১. কক্সবাজার-৪ আসনের সাংসদ বিএনপি নেতা শাহজাহান চৌধুরীর ভাই জামায়াতে ইসলামীর জেলা সেক্রেটারি শাহজালাল চৌধুরী (২৫ জুন '০৩ উদ্ধারকৃত কিশোর জাফরকে

জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব নিয়ে গ্রহণ করেন) ২. আবুল ফজল (বিএনপি নেতা, উখিয়া) ট্যান্স্রি শ্রমিক নেতা, ৩. আব্বাস উদ্দিন (বিএনপি নেতা, উখিয়া), ৪. মাহমুদ (বিএনপি নেতা, উখিয়া), ৫. নূরুল ইসলাম (বিএনপি নেতা, উখিয়া), ৬. নূরুল আলম (বিএনপি নেতা, উখিয়া), ৭. ছৈয়দ আলম (বিএনপি নেতা, উখিয়া), ৮. হালিমা খাতুন (পালংখালী) ৯. দিল মোহাম্মদ (উখিয়া), ১০. কামাল (টেকনাফ), ১১. ইউনুছ (টেকনাফ), ১২. বোরহান (টেকনাফ), ১৩. শামসু (পাতাবাড়ী), ১৪. জমির ফকির (দরগাহ বিল), ১৫. আলী হোসেন (দফা বিল, রাজা পালং), ১৬. জাকির হোসেন (আলী হোসেনের ভাই) (২টি



হাস্যোজ্জ্বল এ মাদ্রাসা ছাত্ররা জানে না তাদের ভবিষ্যৎ।
খড়্গা কৃপান হাতে জঙ্গী মুজাহিদ,
উটের জকি- নাকি কারাগারের
অন্ধকার প্রকোষ্ঠ



দুবাই ফেরত উটের জকি
মাদ্রাসা ছাত্র জাফর আলম

হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে প্রবাসে পালিয়ে যায়। সম্ভ্রান্তি ১৪ বছরের এক কিশোরীকে বিয়ে করে। রাজাপালাং মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পাশের বাড়ির মেয়ে। যেকোনো মুহূর্তে পাচারের শিকার হবে এ কিশোরী এমন আশঙ্কা তার পরিবারের সদস্যদের। ১৭. এইচ এম এরশাদ (জাতীয় পার্টি), বর্তমানে আত্মগোপনে থেকে সক্রিয়, চিংড়ি চোরাচালানসহ অবৈধ অসংখ্য তৎপরতায় অভিযুক্ত। ১৮. এরশাদ উল্লাহ (সীমান্ত পথে মিয়ানমারের নারী শিশুদের বাংলাদেশে অবৈধভাবে ঢুকিয়ে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত নেয় বিমানে সৌদি আরব পাচার করে এমন অভিযোগ রয়েছে) ১৯. বাহাদুর মিয়া (নন্দনকানন, চট্টগ্রামে বসবাস, মিয়ানমার মংগদু শহরের কাহারিপাড়ার আ. কুদ্দুসের

পুত্র) ২০. কালা মিয়া (মিয়ানমার মংগদু শহরের সিকদারপাড়া মূল বাড়ি) স্থানীয় যুবকদের সহায়তায় পাচার করে যাচ্ছে নারী-পুরুষ শিশু) ২১. আবুল হাসান আলী (রাজাপালং মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, কক্সবাজার-৪ আসনের সাংসদের চাচা)। উখিয়ার পাচারকারী সিডিকেটসমূহের নেপথ্য হোতা হিসেবে অভিযুক্ত।

পুলিশ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে অনেকবার স্বীকার করা হয়েছে এ চক্রের তৎপরতা। রাজনৈতিক অপশাসনের ভয়াবহতার কাছে পরাজিত হয়েছে নীতি, শাসন, অনুশাসন। চিহ্নিত সংঘবদ্ধ চক্রের সঙ্গে কুতুব আলম রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ৭ মাঝি (তত্ত্বাবধায়ক) অভিযুক্ত হচ্ছেন।

দাতা সংস্থার অনুদানে চলছে কওমী মাদ্রাসাসমূহ। যার প্রকৃত পরিসংখ্যান সরকারি হিসাবে নেই বলে জানানেন কক্সবাজার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। তবে প্রায় ৭ হাজার কওমী মাদ্রাসা সারা দেশে আছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ। এ মাদ্রাসাগুলোর বার্ষিক অনুদান কোটি কোটি টাকা। যার অধিকাংশ অনাথ শিশুদের শিক্ষা, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থান বাবদ আসে। এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে এই বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করছে এসব মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে এই শিশুদের মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাচার করে আদায় করে বিপুল অবৈধ অর্থ। পাচার হওয়ার পথে যেসব দল ধরা পড়ছে তাদের স্বীকারোক্তি থেকে নাম বেরিয়ে আসছে পাচারকারী দলের। প্রকাশিত হয়ে পড়ছে কওমী মাদ্রাসার আসল চরিত্র। ধরা ছোঁয়ার আড়ালে থেকে গেছে মূল হোতার-এরা স্থানীয় জামায়াত-বিএনপির বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বে প্রশাসন চালাচ্ছে। উদ্ধার হবার পর আবার এরাই এই শিশুদের গ্রহণ করছে। বাস্তব পরিস্থিতি এতোটাই জটিল যে, কঠোর পদক্ষেপ নিতে না পারলে প্রশাসনের ব্যর্থতা এনে দেবে ভয়াবহ বিপদ-এ আশঙ্কায় শঙ্কিত স্থানীয় জনগণ।

স্থানীয় মাদ্রাসাসমূহে অনুসন্ধানকালে এ ধরনের তথ্য প্রকাশ হলে স্থানীয় সিডিকেট সদস্য এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের ওপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। পরিচয় গোপন করে এলাকায় প্রবেশ করতে হয়।

চট্টগ্রাম কক্সবাজার রুট

বৃহত্তর চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুট নারী-শিশু পাচারের অবাধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পুরো বিভাগীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ৮টি সিডিকেট সক্রিয় বলে সূত্রে প্রকাশ। এর মধ্যে ঢাকার ফকিরাপুল এলাকা, চট্টগ্রামের নন্দনকানন, টেরিবাজার এবং খাতুনগঞ্জ এলাকার হোটেলকেন্দ্রিক বিশাল নেটওয়ার্ক কাজ করছে। সহায়তা পাচ্ছে প্রশাসন এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক জোটের- এমন অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

গত প্রায় দেড় দশকে অবাধ পাচারের প্রকৃত পরিসংখ্যান কোথাও নেই। অনুসন্ধান জানা গেছে, কমপক্ষে দশ হাজার নারী-পুরুষ এবং শিশু পাচার হয়েছে এ রুটে, যা অব্যাহত রয়েছে। মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার ২০০২ সালের অনুসন্ধান উঠে এসেছে সীমান্তের বিভিন্ন পথে পাচারকালে ২০০২ সালে উদ্ধার হয়েছে ১০০০-এর বেশি নারী, শিশু। এক্ষেত্রে যারা উদ্ধার হয়নি, এখনো নিখোঁজ-এদের কোনো পরিসংখ্যান কখনোই হয়নি।

সংঘবদ্ধ পাচারচক্র দীর্ঘদিন থেকে এ কাজে সক্রিয়। তবে ১৯৯১ সালে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির স্থাপনের পর উখিয়া-টেকনাফ সীমান্ত পথে বেড়েছে এদের তৎপরতা। বেশ কিছু পন্থায় এরা পাচার করে।

* পাসপোর্টে ছবি বদলে
* নাম-ঠিকানা বদলে স্ত্রী, কন্যা, পুত্রের পরিচয় দিয়ে
* ওমরাহ ভিসার মাধ্যমে (সরকার তিন মাস মেয়াদি ওমরাহ ভিসা দেয়)
* পরিবারকে কয়েক হাজার টাকার লোভ দেখিয়ে

* স্থানীয় তরুণদের কাঁচা টাকার প্রলোভনে কক্সবাজারের বর্তমানে দুটি শরণার্থী ক্যাম্পের একটি উখিয়ার কুতুপালং, অন্যটি টেকনাফ নয়াপাড়া। এই দুই ক্যাম্পে মোট ২০,০৭৮ শরণার্থী। নয়াপাড়াতে ৮০০০ এবং বাকি ১২ হাজার ৭৮ শরণার্থী কুতুপালং ক্যাম্পে। এর বাইরে অবৈধ বসবাসকারী আছে ২০ হাজারের মতো, এ কথা স্বীকার করলেন সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার একজন সদস্য। কুতুপালং ক্যাম্পের বাইরে কমার্শিয়াল ফোনের দোকানে এসেছেন তিনি ফোন করতে।

কুতুপালং ক্যাম্পে অস্থিরতা, বিক্ষোভ, সমাবেশ। ইংরেজিতে পোস্টারে ছেয়ে গেছে। রোহিঙ্গা বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনসমূহ ৭ দফা দাবি জানিয়েছে প্রশাসনের কাছে। উল্লেখ্য, মোট আড়াই লাখ শরণার্থীর (বেসরকারি



নিখোঁজ ৪ জন

১. তসলিমা আক্তার বেবী (৭) (পিতা হাবিবুর আকবর, মা- গুলতাজ বেগম সিকদার পাড়া, মংগদু, মায়ানমার) ২. অজ্ঞাত কিশোর এতিম খানার ছাত্র ৩. সাইফুল মিঠুন ৪. মোঃ ফোরকান মাদ্রাসা ছাত্র

হিসাবে সাড়ে তিন লাখ) ২১টি ক্যাম্প (কক্সবাজার, বান্দরবানের চার উপজেলায়) থেকে ধারাবাহিক প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০০১ সাল থেকে। গত ২ মাস ধরে বন্ধ এ প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া। '৭৮ এবং '৯১তে দুই দফায় বার্মা থেকে পালিয়ে আসা এ শরণার্থীদের জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় আশ্রয় দেয়া হয়। জাতিসংঘ কমিশনের (UNHCR) সহায়তায় ২৬ বছর ধরে বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবিকা এবং জীবনের দায়িত্ব পালন করছে বাংলাদেশ সরকার। সেই সুযোগে সন্ত্রাস, ডাকাতি এবং নারী-শিশু পাচারে প্রত্যক্ষ ভূমিকায় দাঁড়িয়েছে এই শরণার্থীদের মধ্যে RSO, ARNOর বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতৃত্ব। এদের সহযোগিতা দিচ্ছে এদেশীয় দালাল-স্বার্থান্বেষী চক্র, যারা অস্থিতিশীলতার স্থায়ী রূপ দিতে বদ্ধপরিকর।

বর্তমানে ইংরেজিতে যে ৭ দফা রোহিঙ্গা বিদ্রোহীরা দিয়েছে বাংলাদেশে রাজনীতি করার অধিকার, সংগঠন করার অধিকার, প্রতিবেশী দেশে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, তাদের বিরুদ্ধে সব মামলা প্রত্যাহার, পোশাকধারী পুলিশের ক্যাম্পে প্রবেশ নিষিদ্ধ, মায়ানমারে



রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে অনিশ্চিত জীবনের দিকে তাকিয়ে
হাজারো শরণার্থী

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সরকার নির্ধারিত মাঝি (তত্ত্বাবধায়ক) তাদের নির্বাচন করার দাবি রয়েছে। কর্ণফুলী ব্রিজ থেকে আরাকান পর্যন্ত তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করা হয়েছিলো কিছুদিন আগ পর্যন্তও।

বিকিকিনির বাজার : রোহিঙ্গা ক্যাম্প

রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলো যেন নারী-শিশু বিকিকিনির হাট! প্রচলিত অর্থে স্থানীয়ভাবে এ বাকটি বেশ চালু। শরণার্থী হিসেবে সাধারণ নাগরিক অধিকার এখনকার নারী-শিশুদের নেই। এরা কুতুপালং এবং নয়াপাড়ায় পাহাড়ের পাদদেশে খুপরি ঘরে থাকছে। মাথা গোঁজার কোনোয়রকম ঠাই। তবে এ দেশের অধিকাংশ নাগরিক সেই অধিকার থেকেও বঞ্চিত।

এই ক্যাম্পগুলোতে অনেকেই আসে নারী-শিশুর খোঁজে। একটু ভালো থাকবার আশায় স্বেচ্ছায় অনেক বাবা-মাই সন্তানদের দিয়ে দেয়। যিনি নিচ্ছেন তার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন।

২০ আগস্ট '০৪ শুক্রবার। কক্সবাজার সদরের পি.টি.আই স্কুলের পাশে থাকে আবু কালাম (৪০) (যার ভাই প্রবাসী)। জোহরা বেগম এক শরণার্থী। তাকে তার দু' কন্যাসহ আবু কালামের সঙ্গে দেখা যায়। 'কী ব্যাপার জোহরা, কোথাও যাও?' স্থানীয় যুবকদের প্রশ্ন। কন্যা আলান নাহার (১৫) এবং সেতারাকে (১৭) নিয়ে মা জোহরা (৪৫) যাচ্ছে অনিশ্চিতের দিকে। বলে, 'আমার প্রবাসী স্বামীর কাছে ও নিয়ে যাবে।' বাধা দেয় যুবকেরা। বলে, 'তোমার ব্যাটার (স্বামীর) ছবি কি এনেছে আবু কালাম? কী করে জানো ওখানে নেবে?' আবু কালাম দাঁড়িয়ে যায়। ফিরে যায় জোহরা দুই কন্যা নিয়ে। প্রতিবাদী পাঁচ যুবককে ৫০০০ টাকা দেয় আবু কালাম। 'তোমরা কিছু বোলো না। আমার ৪০ জন মানুষ লাগছে। ৩৭ জন হয়েছে। আর তিনজন লাগবে। সবই এই ক্যাম্প থেকে নেয়া।'

কুতুপালং ক্যাম্পের সামনে ফোন-ফ্যাক্সের দোকান একটি খুপরি ঘরে। এখনকার কার্ড আছে। সবাইকে নম্বর দেয়া হয়। মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান থেকে নিয়মিত ফোন আসে চাহিদা মতো সরবরাহ চেয়ে। স্থানীয় মেসবার, চেয়ারম্যানদের উপস্থিতিতেই এসব কথা হয়। এগিয়ে যায় অবাধ পাচার তৎপরতার মতো জঘন্য কাজ।

ক্যাম্পের প্রতি ঘরে মাথার টুপি পরে কোরান শরীফ পড়তে দেখা যায়

কিছু কিশোর তরুণদের। কন্যা শিশুরা আরবি বর্ণমালার বই হাতে লাইন ধরে আসছে- মাথায় কাপড়। কিছু ঘরে তরুণী মেয়েরা হাতপাখা বানাচ্ছে বাঁশের বেত কেটে তাতে বর্ণিল কাপড় গেঁথে অপূর্ব বর্ণে বর্ণিত করে। এরাই হয়তো এক সময় পা বাড়াবে অন্ধকার পথে।

দেহপসারিণী হতে বাধ্য করছে

স্বয়ং ইমপেট্টর

অভিযোগ আছে, রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পগুলোর অসহায় নারীদের বাধ্য করা হয় ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের দেহদানের মাধ্যমে সম্বৃদ্ধ করতে। সম্প্রতি তোলপাড় করেছে এমনি একটি ঘটনা।

কুতুপালং শরণার্থী ক্যাম্পের দায়িত্বরত পুলিশ পরিদর্শক কাউছার বাধ্য করে আনোয়ারাকে তার অনৈতিক প্রস্তাবে সম্মতি দিতে। এ ক্যাম্পের ২ নং পাহাড়ের ৫৪ নং শেডের ২৮,৬১০ নং এমআরসি আনোয়ারার বাবা মৃত আব্দু সোবহান। কাউছার তার অনৈতিক মেলামেশায় বাধ্য করলে অন্তঃসত্ত্বা হয় আনোয়ারা। এ সম্পর্কের কথা জানাজানি হলে সালিসি বৈঠক হয়। কৌশলী কাউছার বিয়েতে রাজি হয়। ৩ নং পাহাড়ের মৌলভী গিয়াস উদ্দিনের পরিচালনায় বিয়ে হয়। সঙ্গে সঙ্গে গর্ভপাতও ঘটতে পারে কাউছার হাতুড়ে পছন্দ। শুরু হয় শারীরিক নির্ধাতন। আবার সালিসি বিচারে ২০ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করে আনোয়ারাকে তালাক প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়। লম্পট কাউছার টাকা না দিয়ে আনোয়ারার হাতে তিন বোতল বিদেশী মদ দিয়ে ধরিয়ে দেয়। ২৫ জুলাই '০৪ সকালে উথিয়া থানায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয় তাকে। পুরো শিবিরে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কাউছারকে প্রত্যাহার করা হয় ক্যাম্পের দায়িত্ব থেকে। আনোয়ারা কারাগারের অন্ধকারে দিন গুনছে মুক্তি প্রতীক্ষায়। এ নিয়ে প্রশাসনের নির্লিপ্ততা প্রকৃত ঘটনা

আড়ালের অভিযোগ আনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে।

জাল পাসপোর্টে বাংলাদেশী সেজে সৌদি আরব নেয়া হচ্ছে বার্মিজ তরুণীদের

জাল পাসপোর্টে ওমরাহ ভিসা লাগিয়ে ২৭ মিয়ানমার নাগরিককে গত ৩ সেপ্টেম্বর '০২ সৌদি আরব পাঠানো হয়। এদের মধ্যে ১৮ মহিলা, ৩ শিশু, ৬ পুরুষ। এরশাদ উল্লাহ চট্টগ্রামের আদম ব্যবসায়ী। যার কাজ ১২০০ টাকার পাসপোর্ট ১২ হাজার থেকে ১৭ হাজার টাকার বিনিময়ে গলাকাটা বা জাল করে অবৈধ পথে নারী-শিশুসহ বিভিন্ন জনকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানো। তিন মাস মেয়াদে ওমরাহ ভিসা নিয়ে মিয়ানমারের এ লোকেরা আর ফেরে না। ঐ পাসপোর্ট দালালের আবার বাংলাদেশে ফেরত এনে ২০ হাজার টাকায় পর্যন্ত বিক্রি করে গলাকাটা ছবি সংযুক্ত করে আবার সৌদি আরব পাঠায় অন্যদের। এ পাসপোর্টে সৌদি আরব সরকারের সিল থাকায় দ্বিতীয়বার চেকিংয়ে সতর্কতা কম হয়। স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ, টেকনাফ কক্সবাজার সড়কের চেকপোস্টসমূহে কড়াকড়ি করলে অনেকটা কমে যাবে এই পাচার তৎপরতা।

জুন-জুলাই '০৪ ৪৬ জন নারী-শিশু গ্রেপ্তার হয় পাচারকারীসহ বিনাইদহে যা ইলেক্ট্রনিক সংবাদমাধ্যমেও প্রচারিত হয়েছে।

২৩ জানুয়ারি ২০০০ রাতে কক্সবাজার থানার পুলিশ শহরের লালদীঘি পাড় থেকে ৭২ নারী-পুরুষ-শিশু উদ্ধার করে। গ্রেপ্তার হয় পাচারকারী পাকিস্তানি নাগরিক শফি আলম। তার বক্তব্য মতে, শিশুদের মাদ্রাসায় পড়ানো, নারী-পুরুষদের কর্মসংস্থানের প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করা হচ্ছিলো। এদের মধ্যে ১২ নারী, ১০ পুরুষ। সূত্র মতে, সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত হয়ে পাকিস্তানে পাচার করে। পতিতালয় বা সৌদি শেখদের হারেমে বিক্রি হয় এই নারীরা।

জুন ২০০০ চট্টগ্রামের নিউমার্কেট এলাকা থেকে এবং কক্সবাজার থেকে কয়েক দফা পুলিশ অভিযানে উদ্ধার হয় ২০০'র বেশি নারী-পুরুষ-শিশু।

মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার তথ্যমতে, ২০০১ সাল থেকে তিন বছরে কমপক্ষে ২ হাজার নারী-পুরুষ-শিশু পাচার হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছে কমপক্ষে ২০ জন সিভিকিট সদস্য। আড়ালে থেকে গেছে মূল অপরাধীরা।

কক্সবাজারের এই নারী শিশু পাচারের সিভিকিটের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে কওমী মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের। মাদ্রাসাগুলোর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক মধ্যপ্রাচ্যের শেখদের। এই সুযোগ নেয় পাচারকারী চক্র। মুখে ধর্মের কথা বলে মানব পাচারের মতো অপকর্ম করছে মাদ্রাসাগুলো। দেশ ও জাতির স্বার্থে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।